গজমোতির দেশে

কাজী জহিরুল ইসলাম

পরিস্কার আকাশ। তিনদিন অবিরাম বর্ষণের পর ঝকঝকে রোদ উঠেছে। বৃষ্টিধোয়া সকালের রোদ খুব তীব্র হয়। তীব্র রোদে পুড়ছে এখন আবিদজান শহর।

এবারের ইয়ামুসুক্রো ভ্রমণটা নানান কারণে আমার জন্য ছিল খুবই ব্যতিক্রম এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের নিরস্ত্রিকরণ ও পূনঃআত্মিকরণ প্রক্রিয়ার সংগে জড়িত প্রথম সামরিক ব্যাটেলিয়ন হিসাবে দায়িত্বগ্রহন করে বাংলাদেশ মিলিটারির ব্যানব্যাট-৪ গতবছর আগস্ট মাসে, যার কমান্ডার কর্ণেল হুমায়ুন বখত। ব্যানব্যাট-৪-এর একবছর ইতোমধ্যেই পার হয়ে গেছে। ওরা এখন দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত। নতুন একটি ব্যাটেলিয়ন বাংলাদেশ থেকে আসছে আগামী ৬ অক্টোবর। নতুন ব্যাটেলিয়নটি ব্যানব্যাট-৪-এর স্থলাভিষিক্ত হবে।

ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে ব্যানব্যাট-৪ ইয়ামুসুক্রোর এলিট শ্রেণীর মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, ওদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবটি মেরামত করে দেয় এবং 'পিস-কাপ টুর্ণামেন্ট' শিরোনামের একটি প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। প্রতিযোগীতাটি অনুষ্ঠিত হবে আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬। কর্ণেল হুমায়ুন অনেকদিন আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন এই দিনটি যেন ফ্রি রাখি। গতকাল কয়েক দফা কথা হয়। শেষমেষ ঠিক হয় আমরা ৩০ তারিখ সকালে ইয়ামুসুক্রোর উদ্দেশে রওয়ানা হব। অগ্নি খুব-ই এক্সাইটেড। আড়াই'শ কিলোমিটারের এই লম্বা ড্রাইভটি বেশ উপভোগ্য। তাছাড়া ইয়ামুসুক্রো গেলে আমরা যে হোটেলটিতে উঠি, সেই প্রেসিডেন্ট হোটেলের চমৎকার সুইমিংপুলে সাঁতারকাটার সুযোগটিই অগ্নির এক্সাইটমেন্টের বড় কারণ। আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ হলো ব্যানব্যাট-৪-এর একবছরের কাজের কিছুটা খোঁজ-খবর করা, যার সাফল্যের সঙ্গে এই মিশনের সাফল্যও জড়িত। লে. কর্ণেল দিদারুল আলম আমাদের পারিবারিক বন্ধু। অগ্নি, জল দু'জনই দিদার ভাইকে বেশ পছন্দ করেন। আমাদের সফরসঙ্গী দিদার ভাই ন'টা বাজার আগেই তৈরী হয়ে আমাদের জন্য সেব্রোকোতে অপেক্ষা করছেন।

সিদ্ধান্ত হলো, প্রতি এক ঘন্টা পরপর গাড়ি থামিয়ে দশ মিটিটের একটা ব্রেক নেব। এতে লম্বা জার্নির ক্লান্তিটাকে এড়ানো যাবে। পথে দু'বার গাড়ি থামালাম। দ্বিতীয়বার যখন গাড়ি থামাই, দেখি রাস্তার পাশে লেখা 'মরোনু'। জায়গাটার নাম মরোনু, পড়তে পড়তে কেমন যেন আমরা সকলেই একটু নড়ে-চড়ে বসলাম। নিজেদের জড়তা দূর করতেই হয়তো 'মরোনু' শব্দটা নিয়ে হালকা রসিকতা শুরু করলাম। আমি ড্রাইভ করছিলাম ১২০ কিলোমিটার গতিতে, এর চেয়ে জোরে গাড়ি চালাবার অনুমতি নেই আমাদের। ১২০ কিলোমিটার গতি আমাদের কাছে যথেষ্ঠ মনে হলেও, পেছন থেকে যখন সাঁই সাঁই করে অন্য গাড়িগুলো আমাদেরকে ভেংচি কেটে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলো তখন আমার ড্রাইভিং ইগোতে বেশ একটু আঘাত লাগছিলো বৈ-কি? এই রাস্তায় প্রায় রোজই দু'একটা এক্সিডেন্ট হচ্ছে। আমাদের ইউএন এক্সপার্টদের অভিমত হলো, দ্রুত-গতিই এজন্য দায়ী। আর আবিদজান-ইয়ামুসুক্রো রাস্তায় এক্সিডেন্ট মানেই হলো ডেথ ক্যাজুয়ালটি। এর প্রমাণতো আমরা পেলামই। সেই ২৫ আগষ্ট ট্রাজেডির কথা মনে হলে এখনো শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই পথেইতো, টিয়াসলে নামক সেই অপয়া জায়গাটায় প্রাণ দিলো আমাদের ৬ বাংলাদেশী সৈনিক। ওইদিনই মাত্র প্লেন থেকে নেমেছিল বেচারারা।

কতো স্বপ্ন ছিল, কত আশা ছিল। এক বছরে যা ডলার আয় করবে তা নিয়ে ঘরে ফিরবে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। সবার মুখে হাসি ফুটবে। একটি মর্মান্তিক সড়ক দূর্ঘটনা সব মিথ্যে করে দিল।

কিছুদূর এগোতেই একটা ছোট্ট শহর পড়লো। এই শহরের নাম তমুদি। ডানদিকে পহাড়ের মাথায় ত্রিভূজ আকৃতির একটা টকটকে লাল চার্চ। বাঁ দিকে এক চিলতে শহর। তমুদির রাস্তায় একদল নারী-পুরুষ ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছে। ওদের পরণে হাতির প্রতিকৃতি আঁকা কড়া হলুদ রঙের পোশাক। প্রায় সব মেয়েরই গলায়, হাতে, হাতির দাঁত ও হাঁড়ের তৈরী অলঙ্কার। আইভরিয়ানদেরকে বলা হয় ইলিফ্যান্ট ন্যাশনাল। হাতিই ওদের জাতীয় প্রতীক। আইভরিয়ান ফুটবল দলটিকেও বলা হয় এলিফ্যান্ট। দেশের সর্বত্রই অতি সুলভে পাওয়া যায় হাতির দাঁত ও হাঁড়ের অলঙ্কারাদি। ছোট বেলায় যে গজমোতির দেশের কথা শুনেছিলাম, আটলান্টিক মহাসাগরের নীল জলের ফেনায় গড়ে ওঠা এইতো সেই গজমোতির দেশ।

হোটেলে ব্যাগ রেখে চলে গেলাম ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তরে। বটতলায় গাড়ি রেখে, ডানদিকের এ্যাবাকাডো গাছটি পেরিয়ে আমরা এসে ঢুকলাম বিশাল হলরুমটিতে। হলরুমে ঢুকেই টের পেলাম আজ খুব গরম পড়েছে। তাপমাত্রা তেত্রিশ। হলরুমের মাথার ওপর তাবুর মতো ছড়িয়ে আছে বিশাল একটি গাছ। কেউ এই গাছটির নাম জানে না। অনামিকা গাছটি মাথার ওপর ছায়া দিয়ে না রাখলে সিনথেটিক তাবুর এই সুবিশাল হলরুমটিতে বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। ওদের জায়েন্ট সাইজের এলসিডি স্ক্রিনে তখন চ্যানেল আই-এর অনুষ্ঠান হচ্ছে। অনুষ্ঠানের নাম, লেটস মুভ। আমরাও বেশ মুভড হলাম এতোদিন পর বাংলা চ্যানেলে অনুষ্ঠান দেখতে পেয়ে। জলের বয়স আড়াই বছর। ও অনেকদিন পর ওর প্রিয় অনুষ্ঠান, বাংলা বিজ্ঞাপন দেখতে পেয়ে দু'হাত ফ্ল্যাপ করে মাথা দুলিয়ে নাচতে শুরু করলো।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবে শ'তিনেক লোকের জমায়েত। প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবের মূল ভবনটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো একটি অর্ধচন্দ্র যেন মাটিতে উপুড় হয়ে আছে। বাঁ দিকে সবুজ ঘাসের গালিচার অপূর্ব ল্যান্ডস্ক্যাপ। ওটাই গলফ কোর্স। আজ সারাদিন খেলা হয়েছে। এখন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং প্রায় তিন'শ লোকের এক বিশাল নৈশ ভোজসভা। ক্লাব কমপ্লেক্সের বিশাল ক্যাফেটারিয়া কাম বারে হুশ-হাশ শ্যাম্পেইনের বোতল লাফিয়ে উঠছে। আবিদজান থেকে আসা অনুসির গলফ-প্রেমিক দলটির সাথে ইয়ামুসুক্রোর স্থানীয় গলফ খেলোয়াড়দের একটি চমৎকার মিলনমেলা বসেছে আজ ক্লাব-বারে। সাদায়-কালোয় কি অদ্ভুত বন্ধুত্ব। ক্রীড়ার কি অপূর্ব শক্তি! এরি মধ্যে সবাই এসে গেছে। সবাই এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে প্রধান অতিথির জন্য। আজকের প্রধান অতিথি সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী জ্যঁ কোনান বেনি। তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শার্লস কোনান বেনির বড় ভাই। কিন্তু তিনি এখনো আসছেন না কেন? এটাই আইভরিকোস্টের সংস্কৃতি, প্রধান অতিথি আসবেন সবার পরে এবং বেশ বিলম্বে। সবাই তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকবে। অনুষ্ঠানে অভ্যাগতদের মাথায় যখন কেবল একটাই চিন্তা কখন আসবেন প্রধান অতিথি ঠিক তখনি তিনি আসবেন। এক্ষেত্রেও তাই হলো। তিনি এলেন নির্ধারিত সময়ের ৪৫ মিনিট পরে। এদিক থেকে বাঙালী সংস্কৃতি আর আইভরিয়ান সংস্কৃতির মধ্যে কোনো তফাত নেই। হঠাৎ দিদার ভাই ছুটে এসে আমার স্ত্রী মুক্তিকে বললেন, ভাবি গেস্ট অব অনার তালিকায় আপনিও আছেন। আপনাকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে। হুমায়ুন ভাইয়ের মাথায় হয়তো এই দুষ্টুবুদ্ধি খেলে থাকবে যে শাড়ি পরা এক বাঙালী নারীকে মঞ্চে তুলে সবাইকে চমকে দিই। পাশাপাশি কিছুটা হলেও বাংলাদেশের স্বরূপ আজকের এই মহতী আয়োজনে তুলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্র-র আয়োজন ছিল। অতি আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের তিনজনের টিকিটই র‍্যাফেল ড্র-তে উঠলো। মুক্তি যেহেতু নিজেই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে

দিচ্ছিলো তাই সে তার নিজের পুরস্কারটি সারেন্ডার করে দিল। জলকে কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না। মঞ্চের পেছনের সুইমিং পুলে ও পারলে এক্ষুণি ঝাপ দেয়। আমরা কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি সমুদ্রে কিংবা সুইমিং পুলে গেলে ও ঘন্টার পর ঘন্টা পানিতে নেমে থাকে। শুধু তাই না, আবিদজান শহরের ওপর দিয়ে যখন গাড়ি চালিয়ে কোথাও যাই, সেটা দিনে কিংবা রাতে যখনই হোক না কেন, যতক্ষণ লেগুনটা দেখা যায় ও ততক্ষণই লেগুনের টলমলে পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহলে কি এটা নামের প্রভাব?

জলের জলজ অত্যাচারে আমরা শেষ পর্যন্ত প্রধান অতিথির ভাষণ না শুনেই হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে হুমায়ুন ভাই ফোন করে বললেন, ঝটপট তৈরী হয়ে নিন, আপনাদের নিয়ে বেশ কয়েকটা জায়গায় যাবো। আইভরিকোস্টের পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল ইয়ামুসুক্রোর আভ্যন্তরীণ রাস্তাঘাটগুলো বিমানবন্দরের রানওয়ের মতো সোজা এবং কমপক্ষে তিন'শ ফুট প্রশস্ত। খুবই পরিকল্পিত শহর। তারচেয়েও পরিকল্পিত রাস্তাঘাট। অথচ সারাদিনে কোন কোন রাস্তায় পাঁচ/দশটা গাড়িও দেখা যায় না। বড় শখ করে আইভরিকোস্টের জাতির জনক দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট উফুয়ে বৈগনি বানিয়েছিলেন এ শহর। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইয়ামুসুক্রোকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে গড়ে তুলবেন। কি নেই এ শহরে? পার্লামেন্ট হাউস, প্রেসিডেন্ট প্যালেস, রাস্ট্রীয় অতিথি ভবন, পাঁচতারা হোটেল, গলফ কোর্স, ইন্টারন্যাশনাল পিস সেন্টার, সুবিশাল একেকটা রাজপথ সব আছে। একটি আধুনিক রাজধানী হবার সব যোগ্যতাই রয়েছে এ শহরের। শুধু প্রেসিডেন্ট বৈগনি নেই। তাঁর মৃত্যু এবং অব্যবহিত পরেই সংঘটিত গৃহযুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে এ শহরের সমস্ত জৌলুস। একটি বিশাল প্রাসাদে কোন মানুষ না থাকলে যেমন প্রাসাদটিকে মনে হয় এক প্রেতপুরী তেমনি আইভরিকোস্টের রাজনৈতিক রাজধানী ইয়ামুসুক্রোতে কোন রাস্ট্রীয় কর্মকান্ড নেই বলে এ শহরটি পরিনত হয়েছে বিলীন হয়ে যাওয়া প্রগৈতিহাসিক কোন এক ইজিপশিয়ান শহরে। এক খা খা বিরান শহর। সেই বিরান শহরে আমরা এক পর্যায়ে হারিয়ে গেলাম। আমরা সবাই উইন্ডস্ক্রিণে চোখ রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি প্রেসিডেন্ট হোটেলের টাওয়ারটি দেখার জন্যে। ওটাই ল্যান্ডমার্ক। এক পর্যায়ে হঠাৎ যেন মেঘের নিচ থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো বেরিয়ে এলো ভ্যাটিকানের চেয়েও বড়, ইয়ামুসুক্রোর গর্ব, সেই বিখ্যাত বাসিলিকার সুবিশাল সুশুভ্র গম্বুজটি। আমরা উল্লসিত হলাম। যাক অন্তত বাসিলিকার গম্বুজটি অনুসরণ করে ব্যাটেলিয়নের বেইজে ফিরে যেতে পারবো। এতো বিশাল-প্রশস্ত রাস্তায় হারিয়ে যাওয়ার কারণ হলো, ইয়ামুসুক্রোর পাহাড়ি ল্যান্ডস্ক্যাপ এবং রাস্তার দু'পাশের ঘন অরণ্য। একেকটি বৃক্ষের উচ্চতা কম করে হলেও দেড়-দু'শ ফুট। পাইন, মেহগনি, পাহড়ি শিমুল, বনবট, জারুল, নিম এবং আরো নাম না জানা অসংখ্য গাছের পাশাপাশি রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত নারকেল, পাম এবং রাবার বাগান।

একই রাস্তায় দুই-তিনবার করে পাক খেতে খেতে অবশেষে এসে পৌছলাম আইভরিকোস্টের একমাত্র ডোমেস্টিক ওয়াটার সাপ্লাইয়ার, ফরাসী কম্পানী সোদেসি-র (SODECI) ইয়ামুসুক্রো অফিসের নির্বাহী প্রধানের বাসায়। বেশ নির্জন অভিজাত এলাকায় একটি ছোটখাট ভিলায় থাকেন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই এই ভদ্রলোক। তিনি আমাদের গ্রিট করে ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই উঁচু শ্রেণীর আইভরিয়ানদের যা রুচি, সেই রুচির পরিচয় পেলাম দেয়ালে ঝোলানো বড় বড় দু'টি অসাধারণ তৈলচিত্র দেখে। একটি ছবিতো খুবই চমৎকার। ধোয়া দিয়ে তৈরী এ্যবস্ট্রাক্ট। কখনো মনে হয় উচ্ছাসে ভেঙে পড়া এক নারী, আবার মনে হয় মরুপ্রান্তরের এক দ্রুতগামী অশ্ব, আবার মনে হয় একটি পাখি ওড়ার অপেক্ষায়। ভদ্রলোকের নামটি আমি এই মুহুর্তে মনে করতে পারছি না বলে বেশ অস্বস্তি লাগছে। কুশল বিনিময়ের পরপরই ১৭ মিলিয়ান আইভরিয়ানের বুকের ভেতরে গুঞ্জরিত প্রশ্নটি করলাম তাকে, সোদেসির পানি

এতো এক্সপেনসিভ কেন? একটি মাঝারি সাইজের এপার্টমেন্ট, যেখানে ৪ সদস্যের একটি পরিবার বসবাস করে, সেই পরিবারকে প্রতি মাসে পানির বিল গুনতে হয় কুড়ি হাজার সিফা (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ২৭০০ টাকা), আপনি কি মনে করেন না সোদেসি মানুষের ওপর জুলুম করছে? ভদ্রলোক বেশ হকচকিয়ে গেলেন আমার এই প্রশ্ন শুনে। তিনি বললেন, আপনিতো দেখি আইভরিয়ানদের মতোই কথা বলছেন। দেখুন, কম্পানিটি ফরাসী বলেই লোকের যতো অসন্তোষ। একটি আইভরিয়ান কম্পানী এই টাকা চার্জ করলে ওরা এসব বলতো না। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সার্ভিসের প্রশংসা করবেন। কখনো কি দেখেছেন আট মিলিয়ন লোকের আবিদজান শহরে এক মিনিটের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ ছিল? দেখেন নি। ভালো সার্ভিসের জন্যতো একটু বেশি পয়সা দিতেই হবে। তাছাড়া আমরা পানি উৎপাদন করি দু'ভাবে। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পাশাপাশি রিজার্ভারের পানি পিউরিফাই করি। ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্লান্টের খরচ সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই ধারণা আছে। পরিবেশের কথাটি মাথায় রেখেই আমার কম্পানি সব পানি মাটির নিচ থেকে তোলে না। আমরা যদি দেশের পুরো পানির চাহিদা মেটাতে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভর করতাম তাহলে অনেক সস্তায় পানি দেওয়া যেত ঠিকই কিন্তু পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি হতো। বুঝলাম ফরাসীরা বেশ ভালোভাবেই এই আইভরিয়ানটির মগজ ধোলাই করেছে। পাশাপাশি একটা বিষয়ের তারিফ না করে পারছি না। সোদেসি একটি বিদেশি কম্পানি হওয়া সত্বেও এখানকার পরিবেশের ভারসাম্যের বিষয়টি মাথায় রেখে ব্যবসা করছে। অথচ আমাদের ওয়াসা এতো পুরোনো একটি রাস্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আজো ভূ-গর্ভস্থ পানি টেনে তুলছে! বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে তাপমাত্রার যে ঋতুবৈরীতা গত এক-দেড় দশক ধরে পরিলক্ষিত হচ্ছে, অতি মাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এর একটি বড় কারণ সন্দেহ নেই। কে জানে সামনে আরো কত বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে।

এই বিষয়ে আর না এগোনোই ভালো। ব্যানব্যাট-৪ সম্পর্কে কথা উঠতেই ভদ্রলোক উচ্ছসিত প্রশংসা শুরু করলেন। শান্তি প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশী মিলিটারিদের ভূমিকা খুবই ইতিবাচক। কমান্ডার হুমায়ুনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মিলিটারি ইয়ামুসুক্রোর মানুষের আক্ষেপ-আক্রোশ কমাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘ সম্পর্কে মানুষের মনে যে নেতিবাচক ধারণা ছিল, সেটা এখন আর নেই, অন্তত আমি ইয়ামুসুক্রোর কথা বলতে পারি।

এরপর আমরা এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইয়ামুসুক্রোর গভর্ণর জনাব ন্দ্রি কোফি আপোলিনেয়ারের বাসভবনে গিয়ে হাজির হই। আগে থেকেই এপোয়েন্টমেন্ট করা ছিল। কাজেই বাড়ির সিংহ দরোজায় কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাদের সসম্মানেই অভিবাদন জানিয়ে অভ্যন্তরে নিয়ে গেল। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনি পেরিয়ে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই দেখি জনাব কফি আমাদের স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ষাটের কোঠায় উপনীত ছোটখাট কৃষ্ণ বর্ণের এক মানুষ। হাসিতে উদ্ভাসিত। সকালের মিষ্টি রোদ তার উজ্জ্বল সাদা দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসির দ্যুতি ছড়িয়ে দিলো পুরো আঙিনায়। সদর ড্রয়িংরুমে আমাদের নিয়ে বসালেন তিনি। নিজেও বসে পড়লেন একটি ডাবল সোফায়। আমাদের দেশের এই পর্যায়ের কোনো নেতার বাড়িতে সাধারণত নেতার নিজের জন্য ড্রয়িংরুমেও আলাদা করে একটি আসন সংরক্ষিত থাকে কিন্তু জনাব কফির ঘরে সেই রকম কোনো আয়োজন দেখলাম না। তিনি নিজে মদ্যপান কিংবা ধুমপান করেন না কিন্তু অতিথি আপ্যায়নের জন্য সবরকম আয়োজনই আছে। তিনি এই বিশাল সরকারী বাড়িটিতে একাই থাকেন। স্ত্রী থাকেন দেশের প্রধান শহর আবিদজানে। দুই মেয়ে পড়ছে আমেরিকায়। একটি ট্রেতে করে খানসামা আমাদের জন্য নানান রকমের পানীয় এবং স্ন্যাকস নিয়ে এলো। বলাই বাহুল্য যে ওতে খুব দামী স্কচ, ওয়াইন এবং বিয়ারও ছিল। তাছাড়া নানান রকম ফলের জুস এবং সফট ড্রিঙ্কসতো ছিলোই। জল নেমেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো ঘরের সবগুলো

ডেকোরেশন পিসের বারোটা বাজাতে। আমরা এতে খানিকটা বিরক্ত হলেও গভর্ণর সাহেব বারবার অভয় দিয়ে বরং ওর হাতে এটা সেটা তুলে দিতে লাগলেন। আমরা গভর্ণরের সাথে বেশ কিছু ছবি তুললাম। বাংলাদেশ সম্পর্কে তার ধারণা জানতে চাইলাম। তিনি অত্যন্ত সরলভাবে বললেন, আমি আসলে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই জানি না। বাংলাদেশ নামে যে একটা দেশ আছে এটাই জানতাম না। যখন বাংলাদেশী মিলিটারি এলো আইভরিকোস্টে তখনি কেবল জানতে পারলাম আপনাদের দেশটির কথা। তবে এখন আমি বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ খুব নরম ধরণের মানুষ এবং খুব শান্তিপ্রিয়। আমি আরো মনে করি বাংলাদেশীরা খুবই অতিথিপরায়ন এবং দয়ালু। মানুষের কষ্ট দেখলে এগিয়ে যায়, মানুষকে সাহায্য করে। আমি প্রশ্ন করলাম, আমাদের ডিডিআর ব্যাটেলিয়ন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি? তিনি বললেন, ডিডিআরের বলেন আর অনুসির বলেন, সাফল্য নির্ভর করে আইভরি কোস্টের মানুষের কাছে তাদের গ্রহনযোগ্যতার ওপর। এদিক থেকে বাংলাদেশী এই ব্যাটেলিয়নটি খুবই সফল। ইয়ামুসুক্রোর মানুষ তাদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসে। এই ভালোবাসা তাদেরকে অর্জন করতে হয়েছে। তারা তাদের যোগ্যতা দিয়েই এই ভালোবাসা অর্জন করেছেন। আমি ইয়ামুসুক্রোর গভর্ণর হিসাবে কর্ণেল হুমায়ুন এবং তার ব্যাটেলিয়নের কাছে কৃতজ্ঞ। নানানভাবে তারা আমাকে সাহায্য করেছে। আমি লেখালেখির সঙ্গে জড়িত একজন মানুষ, একথা জানতে পেরে তিনি আমাকে বললেন, যদি পারেন আপনার লেখনিতে তুলে ধরবেন, আমরা আইভরিকোস্টে বিদেশী বিনিয়োগ আহবান করছি। কোন বাংলাদেশী ব্যবসায়ী যদি বিনিয়োগ করতে চান আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে সাহায্য করবো। শান্তি প্রক্রিয়া নিয়েও তিনি বেশ খোলামেলা কথা বলেন। তার মতে, সরকার এবং বিদ্রোহী দুই দলের শীর্ষ নেতাদের এখন একটাই স্বপ্ন কি করে ক্ষমতায় যাবে এবং ক্ষমতায় গিয়ে অতিদ্রুত ধনী হয়ে উঠবে। আমি মনে করি না শীর্ষ নেতাদের কেউই শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি আন্তরিক। বেশীরভাগের মনেই অসৎচিন্তা। অবৈধ অর্থের লোভে একেকজন হা করে আছে। আর এই সুযোগটি নিচ্ছে বিদেশী শক্তিগুলো।

আমি ভাবছি আমাদের দেশের কথা। রাজনীতিকদের লোভ যদি দেশপ্রেমকে ছাড়িয়ে যায় তাহলে সেই দেশ কেবল পেছনের দিকেই যাবে, কখনোই সামনে এগোতে পারবে না। কতগুলো হাইরাইজ দালান আর কয়েকটি সেতু একটি দেশের উন্নয়নের ইন্ডিকেটর না। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি, স্থিতিশীলতা, জনজীবনের নিরাপত্তা, আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ এইগুলোই হলো দীর্ঘমেয়াদী এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষণ। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা কি কেবল পেছনেই হাঁটছি না? পেশাগত প্রয়োজনে এবং ভ্রমণের নেশায় নানান দেশে ঘুরে বেড়াই। স্বচক্ষে দেখি বিভিন্ন দেশের ইমিগ্রেশন অফিসার আমার অতিপ্রিয় সবুজ পাসপোর্টের প্রতি কিভাবে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে। একজন ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে আমি কে এটা কোন বিষয় না, ওর কাছে বিষয় হলো আমি কি রঙের পাসপোর্ট বহন করছি। কেন টিআই-এর রিপোর্টে বারবার শীর্ষ দূর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের নাম আসে? কেন লক্ষ লক্ষ বাঙালী অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি জমায়? প্রায়শই এসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে। কতো আর ধামাচাপা দেওয়া যায়। থলের বেড়াল একদিনতো বেরিয়ে পড়েই। গত জুনে যখন ছুটিতে ঢাকায় গিয়েছিলাম তখন রোজ ভোরে হাঁটতে বেরুতাম। আমাদের প্রাতঃভ্রমণের ছোট্ট দলটির একজন ছিলেন সাবেক মন্ত্রী এবং আমলা এ.বি.এম. গোলাম মোস্তফা। শেষদিন বিদায় নেবার সময় আশির কোঠায় পৌছুনো এই প্রবীন নেতা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, একটা কথা সবসময় মনে রাখবে। বিদেশের মাটিতে তুমি হচ্ছো বাংলাদেশের এ্যমবাস্যডর। সবসময় চেষ্টা করবে, তোমার প্রতিটি আচরণ যেন দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। এ কথা আমি বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি, প্রবাসী বাংলাদেশীরা কদাচ এমন আচরণ করেন যার জন্য দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে। বরং তাদের কাজ, তাদের পরিশ্রম, তাদের দক্ষতা, তাদের সততা সবসময়ই বিদেশীদের কাছে প্রশংসিত হয়। ইটালিতে, ফ্রান্সে,

জার্মানিতে, বৃটেনে, আমেরিকায় ঘুরে ঘুরে দেখেছি সর্বত্রই বাঙালী কর্মীরা কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হচ্ছে। এমন কি জাতিসংঘের যেখানেই বাংলাদেশী সামরিক/বেসামরিক অফিসার/সৈনিক কাজ করছে, একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সর্বত্রই বাংলাদেশীদের জয়-জয়কার। যখনই অন্য কোন মিশনে বা অন্য কোন দেশে কর্মরত কোন বাংলাদেশীর সাফল্যের কথা শুনি গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে, নিজের অজান্তেই গেয়ে উঠি, আমার সোনার বাংলা / আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু যখনই দেশের আভ্যন্তরীণ চিত্রটি দেখি তখনি ফুটো হয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চিমসে যাই। দু'বছর আগে যখন নিউইয়র্কে বেড়াতে যাই, তখন শুনি ক'দিন আগে আমাদের এক শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা নিউইয়র্কের জ্যামাইকাতে নগদ আট লক্ষ ডলার দিয়ে একটি বাড়ি কিনেছেন। কোত্থেকে আসে এই টাকা? একজন দেশপ্রেমিক প্রবাসী যখন তার সারাজীবনের কষ্টার্জিত অর্থ নিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশে ফিরে যান, দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার অভিপ্রায়ে দেশে বিনিয়োগ করতে চান তখন তাকে ঘিরে ধরে সরকারী-বেসরকারী চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীরা। বছরের শুরুতে একটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকে সংবাদ ছাপা হয়েছিল, এক প্রবাসী ব্যবসায়ী কক্সবাজার থেকে তার শত কোটি টাকার বিনিয়োগ গুটিয়ে আবার বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আমাদের যুবরাজদের দোর্দন্ড প্রতাপে এমনি করে যদি সৎ এবং ইনোভেটিভ ব্যবসায়ীরা মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে দেশের চেহারা বদলাবে কি করে? যেসব সন্ত্রাসীদের ভয়ে প্রবাসী বিনিয়োগকারীরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন আমরা সবাই জানি এইসব সন্ত্রাসীরা কারা? কি এদের পরিচয়? এরা সবাই রাজনীতিকদের হাতের লাঠি, ভোটের গ্যারান্টি। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই এই একই রাজনৈতিক চিত্র নানান ফর্মে দেখা যায়। আজ যখন গভর্নর কফি তার দেশের রাজনীতিকদের দূরভিসন্ধির কথা বললেন তখন আমার দেশের অধিকাংশ রাজনীতিকের অসহিষ্ণু এবং লোভী চরিত্রই চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

হুমায়ুন ভাইয়ের মোবাইল বার বার বাজছে। ফোনে তাগিদ দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট গলফ ক্লাবের ডিরেক্টর তুরে মোহাম্মদ। তুরের ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় দুপুর। তুরে আমাদেরকে তার ক্লাব দেখাতে চাইলো। কিছুক্ষণ ক্লাবের বারটিতে বসলাম। অমায়িক মানুষ তুরে মোহাম্মদ। এখন রমজান মাস। তুরে নিজে রোজা রাখলেও আমাদেরকে আপ্যায়ন করার চেষ্টা করলেন। এদেশের অবস্থাসম্পন্ন মুসলমানেরা প্রতি রমজান মাসে গরীব মুসলমানদের নামের তালিকা তৈরী করে। ধনীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে সারা মাসের খাবার প্রদান করে। যাতে পবিত্র রমজান মাসে কাউকে ভূখা থাকতে না হয়। তুরে সেই প্রোগ্রাম নিয়ে মহাব্যস্ত। সাহায্য চাইলেন ব্যানব্যাটের কাছে, হুমায়ুন ভাই সাহায্যের আশ্বাস দিলেন।

ইয়ামুসুক্রো ছাড়ার আগে আমাদেরকে আরো একটি বাসায় যেতে হবে। যুবকের নাম সুমিত অরুণ চন্দ। সুইস মা আর বাঙালী পিতার সন্তান। ভাঙা ভাঙা কয়েকটি বাংলা শব্দ জানে। ওর মেয়ে বন্ধু গ্রিক বালিকা পিনাকে নিয়ে একটি বিশাল ভিলায় থাকে সুমিত। ওকে কাল রাতেই কথা দিয়েছি ওর ওখানে যাবো। সুমিত বার বার ফোন করছে। ওরা দুজনই অনুসিতে কাজ করে। ইয়ামুসুক্রোর ইলেকশন অফিসার। বাড়ির ভেতরে ওভাল ড্রাইভওয়ে। আমরা গিয়ে বসলাম সুমিংপুল সংলগ্ন ছনের ছাউনিটির নিচে। পাশেই সুমিত-পিনার মুরগীর খামার, তারের জালে আটকানো। বাড়ির ভেতরে বিশাল বিশাল কয়েকটা পাহাড়ি শিমুল, বনবট, আমগাছ, পেটমোটা একটা নিম গাছ আর বেশ কিছু পুরোনো মেহগণি গাছ। ছায়াসুনিবিড় এক বিশাল বাড়ি বলতে যা বোঝায় সুমিতের বাড়িটি ঠিক তাই। মুরগীর খামারের তারের ওপর বসে একটি ঘুঘু করুণ সুরে ডেকে চলেছে।

সুমিং পুল দেখে জল বার বার পুলের চারপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে অগ্নিরও ইচ্ছে নেমে পড়ার। শুধু অনুমতিটা পেলেই হয়। আমরা খুব বেশিক্ষণ বসলাম না। এবার ছুটিতে যখন ঢাকায়

যাবো তখন কোলকাতা বেড়াতে যাবো শুনে সুমিত ওদের কোলকাতার বাড়ির ঠিকানা দিতে চাইলো। আরো জানালো ঢাকায় ওদের পরিবারের অনেকেই এখনো আছে। ওর এক চাচা খুব বড় জাজ। তবে ঠিক কোথায় আছে তা ও জানে না।

আমরা ব্যনব্যাটে এসে দেখি দিদার ভাই অপেক্ষায় অস্থির। তিনটার মধ্যে রওনা হতে না পারলে আবিদজানে ফিরে ইফতারি ধরা যাবে না। তাছাড়া এই রাস্তায় রাতে ড্রাইভ করা অনেকটা সুইসাইড করার শামিল। ইয়ামুসুক্রো-আবিদজান রাস্তায় প্রায় এক-দেড়শ কিলোমিটারের মধ্যে কোন হোটেল-মোটেল কিছুই নেই, এমনকি গাড়ি মেরামতের কোন ওয়ার্কশপ বা ফুয়েল স্টেশনও নেই। লোকালয় চোখে পড়ে ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটার পরপর। এমন পথে রাত করাতো দূরের কথা দিনের বেলায় জার্নি করাও খুব একটা সুখকর নয়। যদি একবার গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ায় তাহলে খবর আছে।

রিয়ার ভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছি আমাদের পেছনে বাসিলিকার সুবিশাল গম্বুজটি ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। আর মাত্র দশদিন। এরপরই ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। আমি যদিও আবার ফিরে আসবো এই গজমোতির দেশে কিন্তু মুক্তি, অগ্নি আর জল হয়ত খুব শিগগিরই আবার আসছে না। বাড়ি ফেরার প্রাক্কালে এই ইয়ামুসুক্রো ভ্রমণটা ওদের জন্য একটা মজার স্মৃতিময় ঘটনা হয়ে থাকবে।

মাইলস্টোনের দিকে তাকিয়ে দেখি আবিদজান এখনো দু'শ কিলোমিটার দূরে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২ অক্টোবর, ২০০৬